দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় নীতিবিদ্যা
(Indian Ethics)

কর্মবাদ
[Theory of Karma]

কর্মবাদকে ভারতীয় নীতিদর্শনে নৈতিকতার পূর্বস্বীকৃতি বলে গ্রহণ করা হয়। কেবলমাত্র আস্তিক দর্শনে নয়, কোন কোন নাস্তিক দর্শনেও কর্মবাদ স্বীকৃত হয়েছে। ভারতীয় দর্শনে একটি নৈতিক নিয়ম স্বীকার করা হয় যা অমোঘ। প্রতিটি মানুষের কর্মই এই নিয়মের অধীন। বিশ্বপ্রকৃতির শৃঙ্খলা যেমন একটি নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয় সেইরকম মানুষের কর্ম জীবনের শৃঙ্খলাও একটি নৈতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়। বৈদিক সাহিত্যে যে নীতির দ্বারা সমগ্র বিশ্বজগৎ পরিচালিত বলে কল্পনা করা হয়েছে সেই নীতি বা নিয়মকে ঋত বলা হয়। সমগ্র বিশ্ব, তার সৌরমণ্ডল, দিবা-রাত্রির পরিক্রমা, ঋতুর পরিবর্তন— এই সমস্তই ঋত-র দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ। ঋক্‌বেদে এই সার্বিক নিয়মের উল্লেখ পাওয়া যায়— ঋতেন বিশ্বম্ ভুবনম্ বিরাজতঃ।

প্রকৃতির ঘটনাবলী যেমন নিয়মাধীন অর্থাৎ ঋত-র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেইরকম মানুষের কর্মও একটি নিয়মের দ্বারা পরিচালিত। বিশ্বে কোনকিছুই অকারণ নয়। এখানে প্রতিটি ঘটনা যেমন ফল উৎপন্ন করে সেইরকম মানুষের কোন কর্মই নিষ্ফল নয়। প্রাকৃতিক ঘটনা যেমন কোন কারণের দ্বারা উৎপন্ন হয় সেই রকম মানুষের কর্ম তার ইচ্ছার দ্বারা উৎপন্ন হয়। কর্ম যে ইচ্ছাপ্রসূত সেই ইচ্ছার সঙ্গে জড়িত থাকে কামনা এবং লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের ধারণা। কর্ম মানুষের ইচ্ছাপ্রসূত হলেও কর্মের ফল

তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। কর্মের ফল কর্তার ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে উৎপন্ন হয়। এইভাবে ভারতীয় দার্শনিক কল্পনা করেছিলেন যে কর্ম ও কর্মফলের মধ্যে কঠোর কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে।

জড়-জগতে যাকে কার্য-কারণবাদ বলা হয় মানুষের কর্মের জগতে তাই কর্মবাদ নামে অভিহিত হয়েছে। জড়জগতে যেমন প্রতিটি ঘটনাই তার কার্য আবশ্যিক ভাবে উৎপন্ন করে, সেইরকম মানুষের প্রতিটি কর্ম তার ফলদান করে। সৎ কর্মের ফল শুভ হয়, অসৎ কর্মের ফল অশুভ হয়। অতএব কোন কর্মই নিষ্ফল নয়।

অনেকের মতে ঋত ও কর্মবাদ দুটি স্বতন্ত্র নিয়ম নয়। ঋত নামক মৌলিক নিয়মটি নৈতিক ও অনৈতিক জগতে শৃঙ্খলার ধারক রূপে নিজেকে প্রকাশ করে। যে নিয়ম বিশ্ব জগতে শৃঙ্খলা রক্ষা করে সেই একই নিয়ম কর্ম ও ফলের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করে।

কর্মবাদের মধ্যে দুটি তত্ত্ব নিহিত আছে— (ক) **কৃতপ্রণাশ** এবং (খ) **অকৃতাভ্যাগম**। কৃতপ্রণাশের অর্থ হল কোন কর্মই যেহেতু নিষ্ফল নয় তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার কৃতকর্মের ফল আবশ্যিকভাবে ভোগ করতে হয়। অকৃতাভ্যাগম-এর অর্থ হল একজন ব্যক্তির কৃতকর্মের ফল অপর ব্যক্তি ভোগ করতে পারে না।

ভারতীয় দর্শনে কর্মকে রাগ বা দ্বেষজন্য বলা হয়েছে। সুখজনক বিষয়ের প্রতি আসক্তিকে রাগ বলা হয়। আবার যা দুঃখজনক তাকে পরিহার করার ইচ্ছাকে দ্বেষ বলে। রাগ ও দ্বেষ প্রসূত এই দ্বিবিধ কর্মই ঐচ্ছিক কর্ম নামে পরিচিত। ঐচ্ছিক কর্ম অব্যর্থ ভাবে ফল উৎপন্ন করে যার দ্বারা মানুষের জীবন প্রভাবিত হয়।

কর্মবাদের আলোচনায় তিন প্রকার কর্মের উল্লেখ দেখা যায়— প্রারব্ধ কর্ম, সঞ্চিত কর্ম ও সঞ্চীয়মান কর্ম। যে কর্ম ফলদান করেছে তাই প্রারব্ধ কর্ম। সঞ্চিত ও সঞ্চীয়মান কর্মকে একত্রে অনারব্ধ কর্ম বলা হয়। যে কর্ম এখনও ফলদান করেনি তাই অনারব্ধ কর্ম। এই কর্ম অতীত জন্মে সঞ্চিত হতে পারে অথবা একজন মানুষের বর্তমান জীবনে ক্রমশ সঞ্চিত হতে পারে। এই শেষোক্ত কর্মই সঞ্চীয়মান কর্ম। কর্মবাদে যদিও একজন ব্যক্তির জীবনে কর্মফলকে আবশ্যিক ভাবে ভোগ্য বলা হয়েছে তাহলেও কোন কোন মতে সঞ্চিত ও সঞ্চীয়মান কর্মের ফলকে অতিক্রম করা সম্ভব বলে মনে করা হয়েছে। যেমন, মীমাংসক মতে নিষ্ঠা সহকারে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম পালনের মাধ্যমে সঞ্চিত ও সঞ্চীয়মান কর্মের ক্ষয় হয়। তবে কোন কারণে একজন মানুষের জীবনে যদি তার এই দ্বিবিধ কর্মের ক্ষয় না হয় তাহলে তাকে সেই কর্মফল ভোগ করার জন্য পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয়। এইভাবে কর্মবাদের সঙ্গে জন্মান্তরবাদ যুক্ত হয়েছে।

কর্ম ও কর্মফল কর্মবাদ কর্ম ও তার ফলের মধ্যে আবশ্যিক সম্বন্ধের কথা বলে যা কার্যকারণ সম্বন্ধ সদৃশ। এই সম্বন্ধটি মূলত নৈতিক। কর্মনিয়মের এই নৈতিক দিকটি লক্ষ করে একে ধর্ম বলা হয়েছে।

এই ধর্মকেই বৈশেষিক দর্শনে 'অদৃষ্ট' বলা হয়েছে এবং পূর্বমীমাংসা দর্শনে 'অপূর্ব' বলা হয়েছে। অদৃষ্টকে একটি অদৃশ্য শক্তি বলা হয়েছে যা একদিকে সৃষ্টির জন্য পরমাণু সংযোগের কারণ এবং অপরদিকে যা কর্মের ফলকে নিয়ন্ত্রণ করে। অদৃষ্টের প্রভাবে কর্ম থেকে পাপ ও পুণ্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু অদৃষ্ট যেহেতু অচেতন তাই অদৃষ্টের পক্ষে কর্মের ফল নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। সেইজন্য বৈশেষিক দর্শনে নিমিত্ত কারণরূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়েছে। এই নিমিত্ত কারণের দ্বারাই কর্ম তার ফলপ্রাপ্ত হয়। কর্ম ও তার ফলের মধ্যে যে আবশ্যিক সম্বন্ধ আছে তা 'অপূর্ব' নামক নীতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

মীমাংসক মতে একপ্রকার কর্মের দ্বারা জীবাত্মার শুভ অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়। যেমন, যাগাদি অনুষ্ঠানের ফলে অদৃষ্ট বা অপূর্ব উৎপন্ন হয়। এই অদৃষ্ট বা অপূর্ব স্বীকার করার কারণ কী? মীমাংসা দর্শনে বলা হয় যে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের ফলে অবিলম্বে স্বর্গরূপ ফল উৎপন্ন হয় না। যাগানুষ্ঠান একটি ক্রিয়া। মীমাংসা মতে ক্রিয়া একক্ষণ মাত্র স্থায়ী অর্থাৎ উৎপন্ন হওয়ার একক্ষণ পরেই ক্রিয়া বিনষ্ট হয় এবং সেই ক্রিয়ার অব্যবহিত পরেই তার ফল উৎপন্ন হয় না। আমরা দেখি যে বাস্তবিক ইহজন্মে যাগানুষ্ঠানের ফলে ইহজন্মেই স্বর্গলাভ হয় না। সমস্যা এই যে যাগানুষ্ঠান ও স্বর্গফল লাভের মধ্যে যদি এই ব্যবধান থাকে তাহলে যাগানুষ্ঠানকে স্বর্গফলের কারণ বলা যায় না। কারণ সর্বদাই কার্যের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে থাকে। স্বর্গফলের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে যেহেতু যাগাদি থাকে না তাই যাগাদিকে স্বর্গফলের কারণ বলা সম্ভব নয়।

কিন্তু যাগাদিকে স্বর্গফলের কারণ বলে স্বীকার না করলে শ্রুতির প্রামাণ্য ব্যাহত হয়। কিন্তু শ্রুতির প্রামাণ্যকে অস্বীকার করা যায় না। সেই জন্য কল্পনা করা হয় যে যাগাদির অনুষ্ঠান ও স্বর্গফলের মধ্যবর্তী 'অদৃষ্ট' বা 'অপূর্ব' নামক একটি পদার্থ আছে। যাগাদি কর্ম ধ্বংস হলেও তার দ্বারা উৎপন্ন অদৃষ্ট স্বর্গফল প্রদান করে।

যে কর্মের দ্বারা জীবাত্মায় শুভ অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় তাকে 'অর্থকর্ম' বলে। দৃষ্টান্তরূপে মীমাংসাশাস্ত্রে বিভিন্ন যজ্ঞ, সন্ধ্যা-আহ্নিক, উপাসনা প্রভৃতি অর্থকর্মের উল্লেখ করা হয়। এই অর্থকর্মকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে— নিত্য কর্ম, নৈমিত্তিক কর্ম ও কাম্য কর্ম।

কোন ফল লাভের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রবিহিত কর্মকে কাম্যকর্ম বলে। যেমন, জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ। এই যজ্ঞ স্বর্গাদি ফল লাভের সাধক অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বর্গকামনা করেন তাঁর কাছে এই যজ্ঞ কাম্যকর্ম।

যে কর্ম সর্বতোভাবে অত্যাজ্য, যা সর্বদা বা নিত্য কর্তব্য, যা যাবজ্জীবন করণীয় তাই নিত্যকর্ম। এই কর্মের কোন ফলশ্রুতি থাকে না। নিত্য কর্মের বৈশিষ্ট্য এই যে এই কর্মের অনুষ্ঠানে কোনও পুণ্য জন্মে না, কিন্তু অননুষ্ঠানে অর্থাৎ না করলে প্রত্যবায় বা পাপ হয়। 'যাবজ্জীবং অগ্নিহোত্রং জুহোতি', 'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত' ইত্যাদি বিধিতে যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র যজ্ঞের এবং প্রত্যহ সন্ধ্যা বন্দনার কর্তব্যতার উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমস্ত বিধিতে কর্মের নিত্যতা প্রতিপাদিত হয়েছে। উল্লিখিত যজ্ঞ এবং সন্ধ্যা উপসনার ফলে পুরুষ কোন পুণ্যই লাভ করেন না; কিন্তু না করলে পাপভোগ করেন।

কাম্যকর্মের সঙ্গে তুলনা করলে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের স্বরূপ আরও স্পষ্ট হয়। নিত্যকর্ম না করলে প্রত্যবায় হয়; কিন্তু কাম্যকর্ম না করলে দোষ হয় না। তবে কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান ত্রুটিহীন হওয়া উচিত। কাম্যকর্মে ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকে। যে ব্যক্তি ত্রুটিহীনভাবে এই কর্ম সম্পন্ন করতে সমর্থ তিনিই কাম্যকর্মের অধিকারী। নিত্যকর্মের আংশিক অনুষ্ঠানও ফলপ্রদ। শাস্ত্রকার তাই বলেছেন যে, নিত্যকর্মে 'যথাশক্তি নিয়ম' এবং কাম্যকর্মে 'সর্বশক্তি নিয়ম'।

নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান না করলে পাপ উৎপন্ন হয়— একথা বলা হয়েছে। কিন্তু নিত্যকর্ম না করা হল একটি অভাব পদার্থ— নিত্যকর্মের অনুষ্ঠানের অভাব। এই অভাব পদার্থ থেকে পাপের মতো ভাবপদার্থ কি করে উৎপন্ন হবে? অভাব থেকে ভাব উৎপন্ন হয় না।

যাঁরা এইরকম সমালোচনা করেন তাঁদের মতে, নিত্যকর্ম পাপের জনক নয়, পাপের জ্ঞাপক, অর্থাৎ নিত্যকর্মের বৈদিক বিধানের দ্বারা বোঝা যায় যে জীবের অশুভ অদৃষ্ট সঞ্চিত আছে। আসলে প্রত্যেক মানুষই অতীতে জন্ম-জন্মান্তরে অজ্ঞানেই নানা নিষিদ্ধ কর্ম করে থাকে। সেই সমস্ত নিষিদ্ধ কর্মের ফল একই সঙ্গে ভোগ করা হয় না। সেই সমস্ত কর্মফল ভোগের অপেক্ষায় থাকে। নিত্যকর্ম অনুষ্ঠান করলে সেই সকল কর্মফলের বিনাশ হয়। সঞ্চিত পাপের অস্তিত্ব স্বীকার না করলে নিত্যকর্ম অনুষ্ঠানের কোন সার্থকতা থাকে না। তাই নিত্যকর্ম শুধুই পাপজ্ঞাপক। কিন্তু নিত্যকর্ম না করলে পাপ উৎপন্ন হয় না।

মীমাংসক মতে, নিত্যকর্মের বিভিন্ন অঙ্গ বা অংশ থাকে। এই সমস্ত অঙ্গ বা অংশের মধ্যে যে অংশটি প্রধান সেই প্রধান অংশের অনুষ্ঠান হলেই নিত্যকর্ম সিদ্ধ হয়েছে বলা হয় এবং এর ফলেই পাপ পরিহার করা যায়। কোন জীবের পক্ষেই নিত্যকর্মের সমস্ত অঙ্গ অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। তবে যথাশক্তি নিত্যকর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত। শাস্ত্রকারগণ তাই বলেছেন যে, নিত্যকর্মের প্রধান অংশ অনুষ্ঠিত হলেই নিত্যকর্ম সিদ্ধ হবে। অন্যান্য অংশগুলি অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হলেও নিত্যকর্ম ব্যর্থ হবে না।

স্মার্ত রঘুনন্দনের মতে, জীবের কোন কর্মই বৃথা নয়। কর্মমাত্রই ফলপ্রসূ। তাই নিত্যকর্মের সমস্ত অঙ্গের অনুষ্ঠান হলে যেমন তার সম্পূর্ণ ফল পাওয়া যায়, সেই রকম তার কোন কোন অংশের অনুষ্ঠান হলে অবশ্যই আংশিক ফল পাওয়া যায়।

নৈমিত্তিক কর্ম কোন একটি ঘটনার নিমিত্ত অনুষ্ঠান করা হয়। নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুতে অশৌচ পালন বা পাপকর্মের পরে প্রায়শ্চিত্ত, পুত্রলাভের পরে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান— নৈমিত্তিক কর্মের দৃষ্টান্ত। এই সমস্ত কর্মেরই কোন না কোন নিমিত্ত থাকে, যা নিত্যকর্মের ক্ষেত্রে থাকে না।

নিষ্কাম কর্ম

নীতিদর্শনে ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্যের নীতি বা মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়। ভগবদ্-গীতাকে আমরা একটি ধর্মগ্রন্থ বলে জানি। কিন্তু এটি এমন একটি গ্রন্থ যেখানে ধর্ম ও নীতিদর্শন পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। এখানে একটি নীতিদর্শন গঠিত হয়েছে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার পটভূমিতে। আবার ধর্ম এখানে পূর্ণতালাভ করেছে নীতি দর্শনের মধ্যে।

গীতার যে মুখ্য অংশে তার নৈতিকতার তত্ত্বকথা আলোচিত হয়েছে তার পটভূমি বিশেষভাবে স্মরণ করা প্রয়োজন। গীতার আরম্ভ হয়েছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ক্ষেত্রে অর্জুনের বিষাদের মধ্য দিয়ে। ক্ষাত্রধর্মের প্রেরণায় অর্জুন কৌরবদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন। একই সঙ্গে অস্ত্রপ্রয়োগের ফলস্বরূপ স্বজন হত্যার গ্লানি তাঁকে